মহাত্মা গান্ধীর সৌন্দর্য-ভাবনা : সত্য নৈতিকতা ও জীবনবোধের এক অনন্য দৃষ্টিকোণ

অনির্বাণ ঘোষ

এক

"... দিকদিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক,
তাই তো আজকে গ্রামে ও নগরে স্পন্দিত লাখে লাখ।"
– সুকান্ত ভট্টাচার্য

যে মহামানবের উদ্দেশ্যে এই রচনা নিবেদিত — তিনি হলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অন্যতম বিস্ময়কর ও বর্ণময় ব্যক্তিত্বাধিকারী — মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) — যিনি জীবন ও কর্মের নানান বিচিত্র ও বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রে অনন্যাবদানের দরুণ জনচিত্তে এক 'অনন্যসাধারণ যুগপুরুষ' হিসেবে বিশ্ববন্দিত হয়ে আছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে 'ভারতাত্মা' তথা 'জাতির জনক' হিসেবে পরিগণিত বা বিবেচিত করা হলেও, তাঁর বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বকে নির্দিষ্ট কোনও পরিচয়ের সীমানায় আবদ্ধ রাখা সুকঠিন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ছিলেন বহু-বর্ণময়।

গান্ধীজীর এই বৈচিত্র্যময় জীবন ও কর্মকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে উপলব্ধি করা যাবে যে — একজন গান্ধীর মধ্যেই সন্নিবেশিত হয়েছিল 'বহু-গান্ধী' সত্তাগুলি। মহাত্মা গান্ধীর দর্শনে জীবন, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, নৈতিকতা ও রাজনীতি প্রভৃতি প্রাঙ্গণের নানান ভাবনার এক 'সামগ্রিক সমবায়' পরিলক্ষিত হয় — যেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এক যৌথ প্রভাবের কথাও অনেক তাত্ত্বিক থেকে শুরু করে সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও উল্লেখ করেছেন। বলা যায়, একদিকে জীবনের প্রথম পর্বের বাল্যাবস্থায় (ইংল্যাণ্ড যাওয়ার পূর্ব অবধি) গৃহ, পরিবেশ, পরিমণ্ডল (encirclement), পিতা-মাতার জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি এবং বৈষ্ণব ধর্মীয় ধ্যানধারণা প্রভৃতির প্রভাবে প্রভাবিত মোহনদাসের ব্যক্তিত্বে পরিলক্ষিত হয় — "প্রেম ও ভক্তির সমন্বয়ে গঠিত এবং সত্যের প্রতি দৃঢ়"[১] — এক ছোট 'মানবপ্রেমী-গান্ধী' সত্তাটি। তেমনই জীবন ও কর্মের নানান বিচিত্র পটভূমিকায়, সময়স্রোতের বহুমুখী ঘটনাপ্রবাহের তরঙ্গের পথ বেয়ে এক সুমহান জীবনদর্শন রচনাকল্পে গান্ধী চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় এক পরার্থবাদী (Altruistic) থেকে শুরু করে এক পাকা সাহেব (তথা ইংরেজ ভদ্রলোক;

১৮৮৩-তে তৎকালীন লণ্ডনে), এক অনুপম কর্মযোগী, এক সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনবাহক, বিশ্বমানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রচারক, বিশ্বশান্তি ও মানব-ঐক্যের একনিষ্ঠ সমর্থক বিশ্বনাগরিক[২], একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ, পশ্চিমী ভোগবাদী যন্ত্রসভ্যতা এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সম্পন্ন ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদ বিরোধী এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, 'অহিংসা', 'সর্বোদয়' ও সত্যাগ্রহের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক, মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক, এক 'অপ্রাতিষ্ঠানিক সৈনিক', 'বিশ্বমানব'[৩] (রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়), দ্বৈত সাংস্কৃতিক জীবন ও পশ্চিমী সর্বজনীনতার[৪] বৈপরীত্যে 'আদর্শ-সজীব সমাজ' ভাবনার প্রবর্তক, দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী (ড: গোপীনাথ ধাওয়ানের ভাষায়); মানবতাবাদী সমাজচিন্তক; রাজনীতির এক 'তাত্ত্বিক-বাস্তববাদী'[৫]; রাজনৈতিক-দার্শনিক, এক সুউচ্চ নৈতিক-রাজনীতির প্রবক্তা, ধর্ম ও সমাজসংস্কারক, কংগ্রেস রাজনীতির এলিটবাদ-উত্তর এক জন-রাজনীতির প্রণেতা, লেখক, বক্তা, জননেতা, ভারতে দলিত আন্দোলনের অগ্রণী, লাজুক-শীর্ণকায় আত্মপ্রকাশে অশক্ত মানুষ, দক্ষ সংগঠক-সম্পাদক, দিব্যজ্ঞানী, যান্ত্রিকতা মুক্ত পরিবেশবিদ, সত্য ও নৈতিকতার মেলবন্ধনপ্রসূত এক সুমহান সৌন্দর্য-ভাবনার প্রণেতা, নারীবাদী চিন্তক, পশ্চিমী যুক্তিবাদী নাগরিক সমাজের এক মৌলিক সমালোচক (পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিকোণে), পাশ্চাত্যের জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিকতাবাদোত্তর এক অদ্বিতীয় ভারতীয়ত্ববোধের রূপকার, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, বিংশ শতকের অন্যতম মৌলিক তত্ত্বকার এবং সর্বোপরি এক সত্যানুসন্ধানী প্রভৃতি সত্তাগুলি।

বর্তমান নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা মহাত্মার এই বহুধাবিভক্ত জীবন ও কর্মের নানা দিকের মধ্যে অত্যন্ত স্বল্পালোচিত একটি ভাবনার প্রতি আলোকপাত করব — যেটি নিয়ে লেখালেখি ও গবেষণা খুব সম্ভবত অধিক হয়নি বা বলা যায় অতীতে ও বর্তমানে, বিশেষত মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশতজন্মবর্ষ উপলক্ষে, দেশে-বিদেশে গান্ধীচর্চার যে নতুন আবহাওয়া রচিত হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে গান্ধী-গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের বিশিষ্ট লেখনী ও কর্মপ্রবাহের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে গান্ধী-অনুশীলনের বা গান্ধীজিকে পুনরাবিষ্কারের যে নবাদিগন্ত উন্মোচিত করেছেন; তাতে মহাত্মার 'সৌন্দর্য-ভাবনা' প্রসঙ্গটি খানিকটা হলেও অনালোকিত বা বলা যায় অনালোচিতই থেকে গেছে; যা বর্তমান সময়ে গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক।

দুই

প্রথমেই উল্লেখ করব যে, প্রবন্ধের সূচনালগ্নেই আমরা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ''মহাত্মাজির প্রতি'' কবিতাটির শেষ দু'টি পংক্তির সাহায্য নিয়েছি; যার মধ্য দিয়ে এটি প্রতিফলিত হচ্ছে যে — মহাত্মার অন্তরাত্মার স্পন্দনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল তৎকালীন সময়ের অজস্র মানুষ, যেখানে নানান ভিন্নতা সত্ত্বেও সকলের আত্মিক মেলবন্ধন ছিল এক সুরে বাঁধা। যা থেকে একটু হলেও বোধগম্য হয় যে, পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে তাঁর ছিল এক 'আত্মিক-টান' এবং এই 'আত্মিক মেলবন্ধনের' দ্বারাই তিনি সমগ্র মনুষ্যজগতের ওপর এক ইতিবাচক অনির্বাণ জ্যোতি ফেলেছিলেন — যার চর্চা ও প্রাসঙ্গিকতা সবসময়ই বিদ্যমান। তাই অন্যপ্রান্তে আর এক প্রখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশের 'মহাত্মা গান্ধী' শীর্ষক কবিতাতেও মহাত্মার মানব-আত্মার প্রতি এক সুদৃঢ় আস্থা, আত্মিক সমুন্নতি এবং প্রেম ও শান্তির মেলবন্ধনপ্রসূত মানব জীবনের প্রকৃত দিশা সরণির রচনা ও সর্বোপরি ১৯৪৬-এর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে তাঁর উপস্থিতির সফলতা প্রভৃতি প্রসঙ্গে মহাত্মার প্রতি কবি জীবনানন্দের এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও প্রণাম নিবেদনের দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কথায় :

> ... মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি সেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে মহাত্মা গান্ধীকে আস্থা করা যায় বলে;
> হয়তো-বা মানবের সমাজে শেষ পরিণতি গ্লানি নয়; হয়তো-বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে।
>
> ('বেলা অবেলা কালবেলা' : ''মহাত্মা গান্ধী'', ১৯৪৭)

বস্তুতপক্ষে, তৎকালীন ও বর্তমান নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের পথ বেয়ে হিংসা-জর্জরিত, অশান্ত, বিদ্বেষপূর্ণ, দ্বিধাগ্রস্ত, বিভক্ত, মূল্যবোধরহিত, নানাভাবে দূষিত, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাচালিত ও ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীর নানা প্রান্তে এবং প্রাঙ্গণে — ক্ষমতার দম্ভ ও মানুষের বর্ধিষ্ণু লোভের প্রেক্ষাপটে গান্ধীজীর সেই সুউচ্চ নৈতিকতাবোধ, আত্মবোধ, ধর্মবোধ, জীবনবোধ ও বিশ্ববোধ-এর পথ বেয়ে গঠিত তাঁর সেই সুমহান জীবনদর্শন ব্যর্থ ও অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হলেও; একটি কথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে, পৃথিবীর যে কোনও দেশের যে কোনও প্রান্তের কোনও মানুষ যখনই কোনোপ্রকারের অত্যাচার, অনাচার, হিংসা, মিথ্যা, শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনা প্রভৃতির শিকার হয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই সকলে মিলে এই মহান মহামানবের নানা ভাবনা এবং মূর্তির নিকট সমবেত হন এবং এঁর ছত্রছায়ার মধ্য দিয়েই তাঁদের অত্যাচার, নিপীড়ন ও নানান দাবির প্রকাশ ঘটান এবং সর্বোপরি মহাত্মার[৬] স্মৃতিস্তম্ভের চরণতলে বসেই হিংসাকে বর্জনের নানা উপায় ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। তাই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সমকালে ও বর্তমানে সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক। তাঁর বিশিষ্টতা তাঁর বহু-বিচিত্রতায়, মানবজাতির প্রতি অনন্য অবদানের দরুন, তাই বোধহয় বিশ্বখ্যাত টাইমস পত্রিকা 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ'দের তালিকায় মহাত্মা গান্ধীর নামটিকে বেশ সুউচ্চ মর্যাদার সঙ্গেই উল্লেখ করেছে।

তিন

তাই, আজ একবিংশ শতকে পৃথিবী জোড়া সাংস্কৃতিক রাজনীতির পালাবদলের প্রেক্ষাপটে; 'আন্তর্জাতিক ক্যারিশমাসম্পন্ন' মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ১৫০ তম জন্মবর্ষ পেরিয়ে দেশে-বিদেশে গান্ধী-চর্চার যে নব আবহ রচিত হয়েছে; সেই পথ বেয়েই জীবন, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রকৃতি প্রাঙ্গণে আমরা যখন তাঁর সুগভীর প্রাসঙ্গিকতা নির্মাণে অগ্রসর হই — ঠিক তখনই মহাত্মার ''প্রতিদিনের সত্য ও নৈতিকতাপ্রসূত'' এক সুমহান সৌন্দর্যভাবনার প্রসঙ্গটিও নতুনভাবে অনুশীলনের দাবি রাখে।

এইবার আমরা আমাদের এই নিবন্ধের মূল আলোচ্যে প্রবেশ করে বুঝতে চাইব মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিতে সৌন্দর্যভাবনার ধরনধারণটা ঠিক কেমন ছিল। প্রথমেই উল্লেখ প্রয়োজন যে, গান্ধীজীর একটি 'শিল্প-দৃষ্টি' ছিল — যা একেবারেই আধুনিক শিল্প বলতে যা বোঝায় তার বিপরীতে অবস্থিত। অনেক তাত্ত্বিকই এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, ''কটিবাস-পরিহিত, মুণ্ডিত-মস্তক, নিরাবরণ দেহ, প্রায় অনাবৃত-পদ মানুষ একটি, অন্য শিল্পচর্চা দূরে থাকুক, নিজের পোশাকে পরিচ্ছদে ও নিত্য ব্যবহার্য উপকরণের আয়োজনেও যিনি নিতান্তই অনাড়ম্বর, একেবারেই বহুলতাবর্জিত — তাঁর ত্যাগপূত জীবন অবশ্যই মহনীয়, দেবতার মতোই পূজ্য; কিন্তু রসের ব্যাপারে তো তিনি পাষাণ দেবতারই মত সংবেদনশূন্য, নিঃস্পৃহ।''[৭] আপাতদৃষ্টিতে, এই রকম একটি ধারণা গড়ে উঠতে পারে, তবে মহাত্মার সৌন্দর্যভাবনার গভীরে নিমজ্জিত হলে বা অবগাহন করলে অনুভব করা যায় যে, তাঁর এই সৌন্দর্যের ধারণার মধ্যে চারুকলা নিয়ে কিছু কিছু ভাবনার ইঙ্গিতও রয়েছে। যেহেতু মহাত্মাজী তাঁর সারা জীবন যতটা ব্যস্ত ছিলেন রাজনীতি ও সমাজ সংগঠন নিয়ে; নিম্নবর্গীয় মানুষের, দরিদ্র, নিপীড়িত ও অবহেলিত জনসাধারণের

জীবনের মান উন্নয়নে যতটা সমর্পিত তাঁর সুমহান সাধনা; ঠিক ততটা ভাবনার অবকাশ বা সুযোগ তিনি হয়ত সৌন্দর্য বা শিল্পকলা নিয়ে পাননি।[৮] একথা তিনি নিজেও অকপটে স্বীকার করে গেছেন। তথাপি যে সুমহান জীবনদর্শন এবং যে সুগভীর নৈতিক মূল্যবোধ তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপিত করেছেন — সেই বিশ্ববোধ, দর্শন ও নৈতিকবোধের ভিতর অনিবার্যভাবেই থেকে যায় তাঁর মনস্বিতা (Magnanimity) তথা মহানুভবতার (Greatness of Mind) প্রাঙ্গণে রচিত শুচিশুভ্র সৌন্দর্য-ভাবনার নানা ইঙ্গিতও। তাঁর 'প্রতিদিনের জীবনসাধনা'র মধ্যেই তা গভীরভাবে নিহিত।

সৌন্দর্য যে শুধুমাত্র রূপের চাকচিক্যের মধ্যেই নিহিত থাকে তা নয়, বরং শুচিশুভ্র নিরাভরণতার মধ্যে, বিশেষত বিনম্র শিশুসুলভ সরলতার (রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণে) মধ্যেও একটা সুগভীর সৌন্দর্য আছে।[৯] এই সৌন্দর্যই যখন মাধুর্যের মহিমায় মণ্ডিত হয়, তখন সে সুষমার স্তরে উন্নীত হয় — যা আমরা মহাত্মা গান্ধীর গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের কথার সূত্র ধরেই তাই আমরা বলতে পারি যে, ''মহাত্মার সেই মহিমান্বিত ও সুমহান ব্যক্তিত্ব থেকে যে প্রভাব ধারাবাহিকভাবে মিশ্রিত ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছিল — তা ছিল সঙ্গীতের মতো, সৌন্দর্যের মতো অনির্বচনীয়।" বস্তুতপক্ষে, তৎকালীন ভারতবর্ষের এক বিশেষ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে ব্রিটিশ প্রভাবাধীন ভারতের অপরিণত সমাজ-জীবনকে একাগ্রচিত্তে, পরিপূর্ণ নিষ্ঠা সহযোগে, নিরলস সাধনা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, এক সুউচ্চ নৈতিকতাবোধ এবং এবং সর্বোপরি পরিচ্ছন্ন সংযমের দ্বারা গান্ধীজি যেভাবে সুঠাম, সুষম করে গড়ে তুলেছিলেন — তাতে শুভ্র-শুচিতা, জ্বালাহীন-ঔজ্জ্বল্য, অতীক্ষ্ণ ঋজুতা, মাধুর্যানুলিপ্ত কাঠিন্য, দৈন্যহীন সারল্য, সত্যের প্রতি আত্মিক-দৃঢ়তা, আর অনুগ্র সংযম[১০] প্রভৃতির দ্বারা 'এক সুমহান সৌন্দর্যভাবনা'র নানা দিকই পরিস্ফুট হয়। বলা যায়, গান্ধীজীর 'প্রতিদিনের জীবন'ই হয়ত হয়ে উঠতে পেরেছিল সঙ্গীতের মতোই — অনির্বচনীয় এক সৌন্দর্যের প্রকাশ।

এক কথায় বলা চলে, মহাত্মা গান্ধীর সৌন্দর্যভাবনা গতানুগতিক সৌন্দর্যভাবনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তাঁর সেই সৌন্দর্যভাবনার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা বিষয় বা অংশ ছিল — যা তিনি তাঁর সমগ্র জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে অনুভব করেছিলেন এবং সর্বসমক্ষে তুলেও ধরেছিলেন। তাঁর সেই ধ্রুবপদগুলি ছিল — 'সত্য', 'ঈশ্বর' ও 'অহিংসা' এবং সর্বোপরি 'নৈতিকতা'।

প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক অম্লান দত্তের ''গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষ প্রবন্ধটির কথা এসে পড়ে — যা গান্ধীজীর জীবনদর্শনের পথ বেয়ে গড়ে ওঠা সৌন্দর্যভাবনা অনুধাবনের ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা সাহায্য করবে। অম্লানবাবু লিখেছেন, গান্ধীর ভাবনায় 'অহিংসা' শব্দটি যেমন ঘুরে ফিরে আসে, তেমনভাবেই রবীন্দ্রনাথের বাণীতেও অনুরূপ শব্দটি হল 'আনন্দ'। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর জীবনদর্শনের মূল বৈপরীত্যের জায়গাও যেমন এটি, তেমনই এখানেই তাঁদের মিলও বটে। 'অহিংসার মূলে আছে আত্মার যোগ। তাই থেকে আনন্দ'।[১১] অর্থাৎ 'অহিংসা'-র দর্শন থেকেই আমরা আনন্দের পথ বেয়ে সৌন্দর্যের দর্শনে অবতীর্ণ হতে পারি। একথা অনস্বীকার্য যে, 'গুরুদেব' (রবীন্দ্রনাথ) ও 'মহাত্মা'র (গান্ধীজির) সমগ্র জীবনদর্শনই গঠিত হয়েছিল ভারতবর্ষের 'ঐতিহ্যগত জীবনবোধ' , সুউচ্চ সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্যের অনেক মনীষীর ভাবনার সমন্বয়ে।[১২] কিন্তু উভয়ের গ্রহণের ও সমন্বয়ের অভিমুখ এবং প্রবণতা ছিল খানিকটা আলাদা। একদিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার ঔপনিষদিক চিন্তাধারা, দর্শন, আধ্যাত্মিকতাবোধ, সুগভীর ভগবৎ-বিশ্বাস, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, পারিবারিক আবেষ্টনী ও সৌন্দর্যচেতনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন — যা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল জীবনব্যাপী এক অনন্ত, অনাবিল আনন্দের উদ্ভাসনে। ঠিক তেমনভাবেই মহাত্মা গান্ধীর জীবনদর্শন ও 'পরার্থবাদী ধর্মবোধ' গঠনে তাঁর গৃহ, পরিবেশ, পিতামাতার জীবন যাত্রা ও তাঁদের ধর্মীয় ধ্যানধারণা, তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডল, সাধক রাইচাঁদ ভাই, রুশ মনিষী

'তলস্তয়', 'গীতা', 'উপনিষদ', 'বুদ্ধের জীবন-দর্শন' ও তাঁর 'ধর্মমত', 'সনাতন হিন্দুধর্ম', 'জৈন', 'বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন', 'রামায়ণ', পরবর্তীকালে 'বাইবেল' বিশেষ করে 'সার্মন অন দ্য মাউন্ট', 'কোরাণ', 'মহাভারত' ও ইংরেজ সাহিত্যিক 'কার্লাইল'-এর লেখা 'হজরত মহম্মদের জীবন ও আচার' প্রভৃতি বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল।[১৩] এক্ষেত্রে একথা বলতেই হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সমগ্র জীবনদর্শন ও জীবনবোধের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা কর্মযোগের মধ্যে যে 'সৌন্দর্য-ভাবনা' পরিলক্ষিত হয় তাতে কিছুটা হলেও এক সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। তবে বিষয়টির গভীরে নিমজ্জিত হলেই দেখা যাবে যে, মানবিক ও ঐশ্বরিক প্রেমে উভয়েই তাঁদের জীবন ও কর্মধারা সমর্পণ করেছিলেন; যেখান থেকে চৈতন্যের এক অমেয় সৌন্দর্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়।[১৪] সেই সৌন্দর্যবোধের প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন হলেও সুগভীর ব্যঞ্জনায় সৌন্দর্যের সেই দুই অভিমুখ একই মনস্বিতা তথা মহানুভবতার (Magnanimity or The Greatness of Mind) দুই অনির্বাণ প্রকাশ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমেই এসে পড়ে তাঁর শৈল্পিক দৃষ্টিকোণেরও কিছু কথা — যা নিয়েও আমরা এই প্রবন্ধে খানিকটা হলেও পর্যালোচনা করবার চেষ্টা করব।

চার

এখন আমরা 'সত্য' এই অভিধাটি নিয়ে কিছুটা পর্যালোচনা করবার চেষ্টা করব যার মধ্যে গান্ধীজীর এক বা বলা যায় প্রতিদিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের নৈতিকতার সমন্বয়ে বা প্রেক্ষাপটে গঠিত এক অনাবিল-অমেয় সৌন্দর্যচেতনার হদিশ মেলে। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, 'সত্য' শব্দটির একটি বা বহু রকমের দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ডিসকোর্স রয়েছে — যা প্রতিটি মানুষের নিকট প্রতিদিনের জীবনবোধের প্রেক্ষাপটের অজস্র মুহূর্তের নানান দৃষ্টিকোণের অঙ্গীভূত। এখন আমরা অবগত যে, মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র জীবনদর্শনের প্রায় সবটাই জড়িয়ে আছে এই সত্য (Truth) শব্দটিকে নিয়ে। সাধারণে এই 'সত্য' একটি ধারণা (Notion) বা প্রত্যয় হিসেবে বর্ণিত। ভারতীয় দর্শনের অদ্বৈত বেদান্ত ধারাটি থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য দর্শন, নানা সমাজতাত্ত্বিক, কালচারালিস্ট, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও বর্তমানের 'পোস্ট-ট্রুথ'-এর গবেষক ও তাত্ত্বিক প্রভৃতি এবং সর্বোপরি পৃথিবীর সকল মানুষ অজস্র ভিন্ন-অনন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে তাঁদের প্রতিদিনের 'জীবনযাপনে' 'সত্য'কে বিচার করেন, ব্যাখ্যা করেন ও অনুশীলনও করেন। অনেকের ভাষায় 'সত্য' বা 'Truth' বলতে — 'Absolute Truth', 'Relative Truth', 'Analytic Truth', 'Priory Truth', 'Synthetic Truth' বা 'Posteriori Truth', 'Post-Truth' প্রভৃতি বোঝায়।

তবে, সত্য প্রসঙ্গে এত সকল ব্যাখ্যা-বর্ণনা-দৃষ্টিকোণের উর্ধে উঠে আমরা যখন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর 'সত্য-বোধের' দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব, তখন আমরা দেখব যে — কত সুন্দরভাবে-সাবলীল ভাবে সমস্ত জটিলতাকে পেরিয়ে মহাত্মা গান্ধী প্রতিদিনের জীবনযাপনে অত্যন্ত সহজভাবে সত্যকে হৃদয়ঙ্গম বা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সত্যের সঙ্গে এক আত্মিক-মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিলেন, যার মধ্যে তাঁর সৌন্দর্যবোধ নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।

গভীরভাবে উপলব্ধি করলে এবং তাঁর আত্মজীবনীটির দিকে তাকালে, পরিলক্ষিত হবে যে, 'সত্য'কে কোনও জড় বস্তু বা ধারণা না ভেবে, 'সত্য'-এর সঙ্গে প্রতিদিনের জীবনের চলনকে তিনি কতটা সহজ ভাবে যুক্ত করতে ও সত্যকে কত সুন্দরভাবে ধারণ-বাহন করে নিজের ও গোটা বিশ্ববাসীর জীবনকে এক সুমহান নৈতিকতার বন্ধনযুক্ত সৌন্দর্যের চাদরে আঁকড়ে ধরে বিশ্বচ্ছন্দের সঙ্গে জীবনচ্ছন্দের এক নব গতি প্রদান করতে পারতেন। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে, 'আত্মবোধ', 'ধর্মবোধ', 'ভারতবোধ' ও

'বিশ্ববোধ' পেরিয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সেই সুমহান 'সত্য-বোধের' দ্বারা সমগ্র বিশ্ববাসীকে এক আত্মিক ও বিশ্বগত সত্ত্বার মেলবন্ধনের প্রেক্ষাপটে রচিত শুচিশুভ্র নৈতিকতার আবরণবেষ্টিত সুউচ্চ সৌন্দর্যচেতনার দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তা অনেকখানি পেরেছিলেনও বটে। গান্ধী বলতেন : 'সত্যই ঈশ্বর' (Truth is God) যার অর্থ : 'সত্য ছাড়া বাস্তবে আর কিছুই নেই বা অপর কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই প্রকৃতিতে।' সেই জন্য তিনি 'সত্য'কে জীবনের সর্বাংশে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর কাছে, 'সত্য'ই সম্ভবত ঈশ্বরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নাম, তাই, ঈশ্বরকে সত্য বলার বদলে বোধহয় এ কথা বলাই অধিকতর যথার্থ যে সত্যই ঈশ্বর'।[১৫] সেই 'সত্য'-সত্তার মধ্যেই মহাত্মা খুঁজে পেয়েছিলেন অজস্র ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত মহাসত্তা।

সেই বিশ্বসত্তাকে যদি 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত করা যায় তাহলে ব্যক্তিগত অজস্র 'আমি সত্তা'ও তো সেই মহাবিশ্ব তথা মহাসত্যের সহিত সমন্বিত। আসলে, আমি আমার ভিতর যে অজস্র সত্তা বা সত্যগুলিকে বা যে আপেক্ষিক সত্যগুলিকে ধারণ ও বহন করি তা প্রকৃতপক্ষে সেই মহা-বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাত্ম।[১৬]

বস্তুতপক্ষে, এই একাত্মতার থেকে বড় সৌন্দর্যের বোধ আর কী বা থাকতে পারে? এখানেই মহাত্মা গান্ধী সত্য, ঈশ্বর ও অনুপম সৌন্দর্যভাবনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন অত্যন্ত সরল ও সুন্দরভাবে। মহাত্মার এই বোধের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় পাশ্চাত্যের স্পিনোজা-র (১৬৩২-১৬৭৭) দর্শনের। স্পিনোজা মনে করতেন, "The greatest good is in knowledge of the union which the mind has with the whole nature. Indeed our individual separateness is in a sense illusory, we are parts of the great stream of laws and cause, parts of God, we are flittering forms of a being greater than ourselves, and endless while we die."[১৭]

প্রসঙ্গক্রমেই এসে পড়ে, সত্য ও ঈশ্বরের বোধ সম্পৃক্ত সৌন্দর্য-ধারণার সঙ্গে বিজড়িত আর এক সুউচ্চ ভাবনার যা গান্ধীজীর সমগ্র জীবন জুড়ে ছিল — তা হল 'অহিংসা'। তিনি বলতেন, ''অহিংসা ও সত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তারা একই মুদ্রা — বা বরং বলা ভাল যে কোনও চিহ্নবিহীন ধাতব চক্রের দুই পিঠ। বস্তুতপক্ষে 'অহিংসা' হল উপায় বা সাধন এবং 'সত্য' হল সাধ্য। উপায়কে উপায় হতে হলে, সর্বদাই তা আমাদের আয়ত্তাধীন হওয়া চাই। তাই 'অহিংসা' আমাদের পরম কর্তব্য।"[১৮] যেহেতু অহিংসাই ছিল প্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ; তাই এই ভাবনা গান্ধীকে তাঁর সেই বহুলতাবর্জিত, অনাড়ম্বর, অনুপম, সহজ-সংযত-সারল্যযুক্ত সৌন্দর্যদর্শনের বোধে উদ্বুদ্ধ হতে সহায়তা করেছিল — যা বোধ করি মহাত্মার জন্মের ১৫৫ তম বর্ষ পেরিয়েও এক বিশেষ প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে। 'সত্যাগ্রহ', 'অহিংসা', 'প্রেম', 'সর্বোদয়', 'আত্মবোধ', 'পরার্থবাদ', 'নিষ্কাম কর্ম', 'সর্বধর্মে সমানত্ব', 'ব্রহ্মচর্য', 'অস্বাদব্রত', 'শরীরশ্রম', 'অপার মনুষ্যত্ব', 'সত্য' প্রভৃতি ধারণা-বোধ ও দর্শন দ্বারা মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের বিপরীতে আন্দোলন থেকে শুরু করে ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন ও মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমাজ গঠন ও মহামানবতার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত উন্মোচনের মধ্য দিয়ে আত্মিক সমোন্নতি ও মানবপ্রকর্ষের এক সুউচ্চ সৌন্দর্য-দর্শন ভাবনার অবতারণা করেছিলেন — যা বর্তমান ও সর্বোপরি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্মুখেও এক বিশেষানুশীলনের দাবি রাখে।

তৎকালীন ও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার করে বলা যেতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধীর বহুবর্ণময় জীবন ও কর্মকাণ্ডের নানান দিকের মধ্যে তাঁর জনআন্দোলন ছাড়াও — আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম থেকে শুরু করে, ব্যক্তি স্বাধীনতার তত্ত্বনির্মাণ, মানবমুক্তি, গ্রামস্বরাজ, গঠনমূলক কর্মকাণ্ড, হরিজন প্রশ্ন, নারীজাতির উন্নয়ন, পরিবেশ চিন্তা, সুউচ্চ নৈতিক-সমাজভাবনা, বিশ্বশান্তি, হিন্দু-মুসলিম আত্মিক

মেলবন্ধন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, অহিংস-অসহযোগ, মানবাধিকার, অপ্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ, সর্বোদয় চিন্তা, পল্লী-পুনর্গঠন ভাবনা, আদিবাসী-মজুর সমাজের মানোন্নয়ন, অছিপ্রথা, উপবাসপ্রথা, আধুনিকতা-বিরোধী সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন, বুনিয়াদি শিক্ষা, সাব-অলটার্ন ভাবনা, পশ্চিমী ভোগবাদী যন্ত্রসভ্যতা এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বৈষম্যবাদ বিরোধী এক বিকল্প ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মোচন, দ্বৈত সাংস্কৃতিক জীবন ও পশ্চিমী সার্বজনীনতার বৈপরীতে স্থাপিত 'এক আদর্শ সজীব সমাজ ভাবনা, নৈরাজ্যবাদ, তাত্ত্বিক বাস্তবতা, এক সুউচ্চ নৈতিক রাজনীতিবোধ, পশ্চিমী যুক্তিবাদী নাগরিক সমাজের এক মৌলিক সমালোচনা, পাশ্চাত্যের জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত আধুনিকতা ও উপনিবেশিকতাবাদোত্তর এক অদ্বিতীয় ভারতীয়ত্ববোধের ভাবনা প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই আমরা সত্য ও নৈতিকতার মেলবন্ধন প্রসূত এক সহজ সরল অনুপম ও সুমহান সৌন্দর্য-ভাবনার প্রকৃতস্বরূপ খুঁজে পাই।

অন্যভাবে বলা যায় যে, আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে সৌন্দর্য বলতে যে রূপ বা বর্ণের সুশোভিত প্রকাশকে বর্ণিত করি — মহাত্মা গান্ধীর ক্ষেত্রে কিন্তু সেই কথাটি খাটে না। কারণ তিনি তাঁর বহুবর্ণময় ও বিচিত্র জীবন ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই সেই সত্য ও নৈতিকতার মেলবন্ধনপ্রসূত অমেয় ও অনাবিল সৌন্দর্যকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামের নিরক্ষর, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত মানুষের জীবনকে অপার মনুষ্যত্বের আলোকে আলোকিত ও প্রজ্জ্বলিত করার মধ্য দিয়েই তিনি সৌন্দর্যের দর্শন খুঁজে পেয়েছিলেন।

পাঁচ

প্রবন্ধের শেষে পৌঁছে এখন আমরা গান্ধীজির শিল্পভাবনা নিয়েও কয়েকটি দিক পর্যালোচনা করব — যা তাঁর সৌন্দর্যচেতনার পথ বেয়েই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'সৌন্দর্যবোধ' শীর্ষক প্রবন্ধটির দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলতে পারি যে তিনি সৌন্দর্য বলতে — ''মঙ্গলের পূর্ণ মূর্তি এবং মঙ্গল মূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণ স্বরূপ'' বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই মিলিত প্রয়াস বা মেলবন্ধন সাধিত হয়েছে সেই অসামান্য মানুষটির দ্বারা, যিনি কেবল নিজের জীবনকেই এক অপূর্ব শিল্পসত্তাতে পরিণত করেছেন তা নয়, বরং মানুষের শিল্পী মনকে তা এমনভাবে নাড়া দিয়েছে যে তার ফলে কাব্য চিত্র ভাস্কর্য পেয়েছে প্রকর্ষের আস্বাদ। রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর কথাই বলতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে মহাত্মা গান্ধীই ছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি সেই সময়কার সমস্ত পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা পেরিয়ে 'জীবন'কে তথা 'জীবনবোধ'কে সুন্দর ও মহৎ করে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, বিশ্বছন্দের সঙ্গে নিজের জীবনকে বা জীবনের প্রতিটি ছন্দকে সামঞ্জস্যের সুষমায় মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন এবং সর্বোপরি, সহজ-সংযত সারল্য আর শুচিশুভ্র সংস্কারের মধ্য দিয়ে এক শ্রেষ্ঠ 'আত্মিক-জীবন শিল্প'-র পথ উন্মোচিত করে গিয়েছিলেন — যা আজকের একবিংশ শতকের দোদুল্যমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণে প্রাসঙ্গিকতা ও বিশেষানুশীলনেরও দাবি রাখে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর সমগ্র জীবনযাত্রায় অজস্র লেখালেখি করেছিলেন। নানা প্রবন্ধ, নিবন্ধ, বক্তৃতা, চিঠিপত্র, আত্মজীবনী, হিন্দুস্বরাজ প্রভৃতি নিয়ে তাঁর সমগ্র রচনাবলী সাম্প্রতিককালে একশো খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। যার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। এর মধ্যে শিল্পকলা প্রসঙ্গে তাঁর কথাবার্তা খুব কমই চোখে পড়ে। বস্তুতপক্ষে গান্ধীজীর রচনাসম্ভারে 'নন্দনভাবনা-তত্ত্ব' নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তাকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে যথাক্রমে শান্তিনিকেতনের তদানীন্তন ছাত্র জি. রামচন্দ্রন ও বিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রী দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে একটু বিস্তৃতাকারে মহাত্মা গান্ধী তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। আবার ১৯৯৪ সালে গান্ধীজীর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী

উপলক্ষে বিশ্বভারতীতে যে আলোচনা সভা হয়েছিল, তাতে প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্পতাত্ত্বিক কে. জি. সুব্রহ্মণ্যন যে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন 'Gandhi And The Indian Cultural Science' শিরোনামে — তার অনেক তথ্যই ১৯২৪ সালে গান্ধীর সঙ্গে জি. রামাচন্দ্রন-এর শিল্পকলা প্রসঙ্গে কথোপকথন থেকে নেওয়া।[১৯]

গান্ধীর কাছে প্রকৃত শিল্পের অর্থই ছিল 'সজীব আত্মার বিকাশ'। এখানে তিনি অন্তরঙ্গ প্রকাশের ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন। যার দ্বারা মানুষ সত্য, কল্যাণ ও মঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিজেদের আত্মিক সমুন্নতি ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। শিল্পে নৈতিকতার সুউচ্চ স্থান নিয়েও গান্ধীজী কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে শিল্পের মধ্যে ও শিল্পীর মধ্যেও অতি উচ্চমার্গের নৈতিক ধ্যানধারণা বর্তমান থাকাই শ্রেয়, কারণ তবেই তা প্রকৃত পর্যায়ে উন্নীত হয়ে উঠতে পারে এবং সর্বোপরি মানুষের মঙ্গলসাধনা করতে পারে।

অন্যদিকে দিলীপকুমারের সঙ্গে গান্ধীজীর কথোপকথনের মধ্যেও আমরা এক সবলতম সুষমা-বেষ্টিত, অনুপম সৌন্দর্যের আভাস পাই — যার মধ্যে কোনও চোখধাঁধানো কৃত্রিমতা নেই। দিলীপকুমারের 'সন্ন্যাস-শিল্প' শব্দ প্রসঙ্গে মহাত্মা বলেছিলেন যে, সন্ন্যাসই হল জীবনের সবচেয়ে বড় শিল্প যেখানে 'প্রতিদিনের জীবনে' সরল-সবলতম সুষমাকে পরম সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা যায় — সকল কৃত্রিমতার উর্ধে উঠে। একসময় শ্রীমতী আগাথা হ্যারিসনের প্রশ্নের (''আপনি কি মানুষকে বলবেন না যে, ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমিতে ফুলের চাষ করো? দেহের পক্ষে যেমন খাদ্য আবশ্যক আত্মার পক্ষেও তো রঙ ও সৌন্দর্যের প্রয়োজন তেমনি!") উত্তরে বলেছিলেন — "No I won't. Why can't you see the beauty of colour in vegetables? And then, there is beauty in the speckless sky. But no, you want the colours of the rainbow which is a mere optical illusion. We have been taught to believe that what is beautiful need not be useful and what is useful cannot be beautiful. I want to show that what is useful can also be beautiful."

উপরি-উক্ত মতামতটির রেশ টেনে বলা যায় যে, মহাত্মা গান্ধী ছিলেন এমন এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব যিনি প্রয়োজনীয়তার মধ্যেও যেমন সৌন্দর্যকে খুঁজে পেতেন ঠিক তেমনিই প্রয়োজনাতীতের মধ্যেও এক অনুপম সহজ-সরল অনাড়ম্বর সৌন্দর্যবোধকে উপলব্ধি করতে পারতেন — যা আজকের একবিংশ শতকে নজিরবিহীন।

বস্তুতপক্ষে, মহাত্মার সৌন্দর্যবোধ প্রয়োজন আর প্রয়োজনাতীতের গণ্ডি পেরিয়ে, সর্বদাই সত্য ও নৈতিকতার মেলবন্ধনপ্রসূত এক আত্মিক বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে। তাঁর অভিমতানুসারে, "Jesus, to my mind, was a supreme artist because he saw and expressed truth."

প্রসঙ্গত, দুটি ঘটনার উল্লেখ এই প্রেক্ষাপটে বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। তবে আমরা এই প্রসঙ্গে অতি দীর্ঘালোচনায় না গিয়ে ক্রমানুযায়ী সেগুলি নিয়ে টুকরো টুকরো কিছু কথা বলব। প্রথম ঘটনাটি ১৯২৭ সালে তৎকালীন ইটালিতে মহাত্মার সিস্তিন চ্যাপেল ভ্রমণ। সেখানে তিনি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটি মূর্তি দেখে বলেছিলেন যে, ''এই মূর্তিটি আমার অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং এর দ্বারা আমি নির্বাকও হয়ে গিয়েছিলাম।"

প্রকৃতার্থে, সেই মূর্তিটি গান্ধীজীর আত্মিক সত্তাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। সেই মূর্তির সৌন্দর্যের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। বলা যায়, মহৎ শিল্প সর্বদাই তার আপন মাধুর্য আপনার থেকেই পরিস্ফুট করে।[২০]

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হল মহীশূরের বেলুড়ের একটি প্রাচীন মন্দিরকে নিয়ে। মন্দিরটিতে একটি কালো পাথরের মূর্তি ছিল। যার মধ্যে এক 'অর্ধনগ্না নারী তার বস্ত্রের প্রান্তভাগ দিয়ে

একজন লালসাসক্ত পুরুষের আক্রমণ থেকে নিজের লজ্জা বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করছিল এবং সেই লালসাসক্ত পুরুষটি শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়ে একটি বিছার রূপে নারীটির পদপ্রান্তে পড়েছিল।' এই মূর্তিটির সুগভীর তাৎপর্যও তাঁর কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল। তাই তিনি বলেছেন, ''আমি সেই শিল্প ও সাহিত্য চাই যা লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে।''[২১]

সর্বশেষে, আমরা বলতে পারি যে, প্রতিদিনের জীবনযাপনের প্রেক্ষাপটে যে জীবনবোধ গড়ে ওঠে তার সহজ সরল উদাত্ততা ও সৌন্দর্যই মহাত্মা গান্ধীর মতে শ্রেষ্ঠ শিল্প তথা এক বিরল নন্দনভাবনা। তিনি তৈরি করেছিলেন এক স্বতন্ত্র প্রকৃতি বা এক স্বতন্ত্র বাস্তব যার মধ্যে 'সত্য', অহিংসা ও সুউচ্চ নৈতিকবোধের এক সুগভীর 'সৌন্দর্য-শিল্প'-বোধ বর্তমান এবং সেখানে তথাকথিত রূপ সৌন্দর্য তথা বহিরঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনার উর্ধে উঠে মহাত্মা গান্ধী সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট এক 'সুমহান জীবনের সৌন্দর্য ভাবনা' আনতে চেষ্টা করেছিলেন — যা আজও প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যতেও সমভাবে গুরুত্বসহকারে গ্রহণীয় হবে।

সূত্রনির্দেশ :

১ সুজিত কুমার ভট্টাচার্য, মহাত্মা গান্ধী, প্রগতিশীল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯।

২ তদেব, পৃ. ১১।

৩ উদ্ধৃত, দেবনারায়ণ মোদক, সার্ধশতবর্ষে গান্ধীজী : প্রাসঙ্গিক ভাবনা, কথাকৃতি, নদীয়া, ২০২১, (গান্ধীচর্চা : প্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)), পৃ. ২৫।

৪ শিবাজীপ্রতিম বসু, 'মহাত্মা গান্ধী : মৌল প্রশ্ন — মৌলিক ভাবনা' ভারতবর্ষ : রাষ্ট্রভাবনা (সম্পাদনা) সত্যব্রত চক্রবর্তী, প্রকাশন একুশে, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৪, পৃ. ১৮৭।

৫ অনির্বাণ ঘোষ, 'সহমতে ও মতভেদে গুরুদেব ও মহাত্মা : এক মহামেলবন্ধনের রূপরেখা', পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক গবেষণাগ্রন্থ (সম্পাদনা) ড. মহীতোষ গায়েন, শুভজিত মুখোপাধ্যায়, (২য় খণ্ড), বর্ণাশ্রম প্রকাশন সংস্থা, কলিকাতা, ২০২২, পৃ. ৬৯।

৬ তদেব, পৃ. ৭০।

৭ মন্মথনাথ সান্যাল, 'গান্ধীজির শিল্পদৃষ্টি', গান্ধীজি : ফিরে দেখা (সম্পাদনা) বারিদবরণ ঘোষ, সাহিত্যম প্রকাশনা, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৩১৯।

৮ মৃণাল ঘোষ, 'মহাত্মা গান্ধীর সৌন্দর্য-ভাবনা', তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), কোরক সাহিত্য পত্রিকা, সার্ধশতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৬০।

৯ মন্মথনাথ সান্যাল, 'গান্ধীজীর শিল্পদৃষ্টি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০।

১০ তদেব, পৃ. ৩২০।

১১ অম্লান দত্ত, প্রবন্ধ সংগ্রহ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৪২৪।

১২ মৃণাল ঘোষ, 'মহাত্মা গান্ধীর সৌন্দর্যভাবনা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০।

১৩ অনির্বাণ ঘোষ, 'রাজনীতি, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে : রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি', ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল, ড. অনুপ বিশ্বাস, ড. সৌরভ দাস (সম্পাদিত), উদ্দালক পত্রিকা, সপ্তদশ বর্ষ, (১ম সংখ্যা), জানুয়ারি-জুন, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ৩২।

১৪ মৃণাল ঘোষ, 'মহাত্মা গান্ধীর সৌন্দর্যভাবনা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০।

১৫ মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত রচনা, তৃতীয় খণ্ড, নব জীবন, আমেদাবাদ, ২০০০, পৃ. ১৬৫।

১৬ মৃণাল ঘোষ, 'মহাত্মা গান্ধীর সৌন্দর্যভাবনা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২।

১৭ Will Durant, 'The Story of Philosophy', Pocket Books, ১৯৬১; (উদ্ধৃত, মৃণাল ঘোষ, 'মহাত্মা গান্ধীর সৌন্দর্যভাবনা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২।

১৮ মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮।

১৯ মৃণাল ঘোষ, 'মহাত্মা গান্ধীর সৌন্দর্যভাবনা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫।

২০ তদেব, পৃ. ২৬৭।

২১ তদেব, পৃ. ২৬৭।

অনির্বাণ ঘোষ : গান্ধী ও পোস্ট-ট্রুথ গবেষক।